গত কয়েক বছরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠলেও বিরোধী রাজনীতির পরিসরটি জোরালো হয়নি

শেষ প্রহরের জোটের ডাকে বাজিমাত হবে কি?

গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন প্রশ্নে শাসক দলকে জেরবার করার সুযোগ হারিয়েছে বামেরা। তাই এখন জোটের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে। এ রকম সন্ধিক্ষণে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে নির্বাচনী জোট হবে কি না তাই নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে। জোটের সম্ভাবনা নিয়ে কংগ্রেস ও বাম দলগুলির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। বঙ্গ রাজনীতিতে বিরোধী দলগুলির মধ্যে নির্বাচনী জোট নতুন ব্যাপার নয়। ১৯৬৭ সালে কিছু বাম দলগুলোর সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচন পরবর্তী আঁতাত হয়েছিল আর ১৯৬৯ সালে তাদের মধ্যে প্রাক নির্বাচনী জোট হয়েছিল। ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে কিছু বাম দলগুলির সঙ্গে জনতা পার্টির প্রাক নির্বাচনী জোট হয়। এই প্রত্যেকটা নির্বাচনী জোট, প্রধানত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তথা সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে হয়েছিল। অর্থাৎ কেন্দ্র এবং রাজ্যে কংগ্রেস দলকে শাসন ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে সেই সময় বিরোধী শক্তি একজোট হয়েছিল। বাম আমলে, তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বহুবার বিরোধী শক্তি একজোট হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতি করতে গিয়ে তৃণমূল, ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে প্রাক নির্বাচনী জোট করেছিল (১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এবং ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে)। অন্য দিকে ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচন, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে প্রাক নির্বাচনী জোট হয়েছিল। মনে করা দরকার যে বামফ্রন্ট আমলে যখনই তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার উদ্যোগ নিতেন তখনই বামেদের তরফ থেকে সেই জোট কে 'ঘোঁট' বলে কটাক্ষ করা হত। একই রকম ভাবে সম্প্রতি বামফ্রন্ট আর কংগ্রেসের মধ্যে নির্বাচনী জোট নিয়ে যখন জল্পনা ও পরিকল্পনা দুটোই চলছে, তখন তৃণমূল নেত্রী এবং তাঁর সেনানীগণ বিরোধী শক্তির নির্বাচনী জোট গড়ার প্রয়াসকে 'ঘোঁট' বলে কটাক্ষ করছেন। বাংলায় শাসক দল বদলেছে। কিন্তু বিরোধী দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী জোট গড়ার প্রক্রিয়ার সময় বিরোধীদের সম্পর্কে শাসক দলের কটাক্ষের ভাষার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

বিরোধীদের জোট নিয়ে শাসক দলের কটাক্ষের তীব্রতা ও নির্বাচনী রাজনীতির অঙ্ক থেকে পরিষ্কার যে রাজ্যে বিরোধীরা যদি একজোট হয় তা হলে শাসক দল অবশ্যই একটু অসুবিধায় পড়বে। সে ক্ষেত্রে একাধিপত্য বজায় রেখে নির্বাচনে লড়াই আর একটু কঠিন হয়ে পড়বে। এই বিষয়ে শাসক ও প্রধান বিরোধী শক্তি কিন্তু অবহিত। তাই তৃণমূল নেত্রী সম্প্রতি কংগ্রেস দলের সহ-সভাপতিকে অনুরোধ করেছেন যে, সিপিআই(এম) এর সঙ্গে যেন কংগ্রেস জোট না করে। অন্য দিকে বামফ্রন্টের রাজ্য নেতারা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জোটের বার্তা দিয়ে জোটের বলটা ক্রমশ কংগ্রেসের কোর্টে ফেলছেন। যদি কোনও কারণে কংগ্রেস সভানেত্রী, বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট না করতে চান তা হলে বামেরা বলতে পারবে যে কংগ্রেস আসলে তৃণমূলের বি-টিম (যেমন বিরোধী থাকাকালীন তৃণমূল বলত কংগ্রেস, বামফ্রন্টের বি-টিম) এবং কংগ্রেস রাজ্যে সরকার পরিবর্তন চায় না। সেই ভাবে সরকার বিরোধী ভোটকে বামেরা নিজেদের দিকে টানতে চেষ্টা করবে। রাজ্য কংগ্রেসের এখন যা সাংগঠনিক শক্তি তাতে বিধানসভায়, নিজেদের আসন সংখ্যা মোটামুটি ধরে রাখার জন্য জোট ব্যতিরেকে অন্য কোনও উপায় নেই। অন্য দিকে একলা চলো নীতি নিলে যে কংগ্রেসের লাভের থেকে ক্ষতি বেশি হতে পারে সেই বিষয়ে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি থেকে শুরু করে কংগ্রেসের বেশির ভাগ রাজ্য নেতারা মনে করেন। তাঁদের অধিকাংশ অবশ্য ইতিমধ্যে তৃণমূলের পরিবর্তে বামেদের সঙ্গে জোট করতে আগ্রহী। তৃণমূলের সঙ্গে জোট গড়ে কংগ্রেসের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল (ইউপিএ-২ সরকারে তৃণমূলের ব্ল্যাকমেল এবং মাত্র তিন বছর পর সমর্থন প্রত্যাহার) এবং তৃণমূল, রাজ্যে কংগ্রেসকে একপ্রকার সাইনবোর্ডে পরিণত করার প্রায় উপক্রম করছে। অন্য দিকে বামেদের সঙ্গে ইউপিএ-১ সরকারে নোট চালাচালির অপেক্ষাকৃত ভদ্র ব্যবহার (এবং তৃণমূলের থেকে বামেরা প্রায় এক বছর বেশি সমর্থন জুগিয়েছিল)। এমতাবস্থায় কংগ্রেস সভানেত্রী যদি মধ্য বঙ্গে নিজেদের দুর্গ অক্ষত রাখতে তৃণমূলের সঙ্গে জোট করেন তা হলে তৃণমূলের তরফ থেকে ২০১১ সালের তুলনায় অনেক কম আসন ছাড়া হতে পারে। কারণ তৃণমূল শাসক দল এবং তারা মধ্য বঙ্গে শক্তি বাড়াতে তৎপর থাকবে। অন্য দিকে বামেদের কাছ থেকে কংগ্রেস, তৃণমূলের থেকে অবশ্যই বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রতিশ্রুতি পেতে পারে। আর বাম কংগ্রেস জোট হলে মধ্য ও উত্তরবঙ্গে সেই জোট তৃণমূলের থেকে একটু এগিয়েই থাকবে।

> যদি কোনও কারণে কংগ্রেস সভানেত্রী, বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট না করতে চান তা হলে বামেরা বলতে পারবে যে কংগ্রেস আসলে তৃণমূলের বি-টিম এবং কংগ্রেস রাজ্যে সরকার পরিবর্তন চায় না।

আশা করা যায় যে বাম নেতারা জানেন যে তাঁরা কেউ কমিউনিস্ট পার্টি অফ কেরল বা বাংলা বা ত্রিপুরা করেন না। তাই রাজ্যের স্বার্থ দেখা ছাড়াও ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেও এই বিধানসভায় তাঁদের ঘুঁটি সাজাতে হবে। এই মুহূর্তে বাংলায় কংগ্রেস দল দুর্বল। তার সঙ্গে কেরল বা ত্রিপুরার কংগ্রেসের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তির কোনও তুলনা হয় না। অন্য দিকে লোকসভায় বাংলার প্রতিনিধি কেরল ও ত্রিপুরা মিলে যা হয় তার প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ বাংলায় যদি বামফ্রন্ট দুর্বল হয় তা হলে জাতীয় রাজনীতিতে তার ফল বামফ্রন্টের পক্ষে আরও নেতিবাচক হবে। এ কথা অনস্বীকার্য যে বঙ্গ রাজনীতির এখন প্রধান দ্বন্দ্ব হল রাজ্যের শাসক দলকে কেন্দ্র করে। বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে গত পাঁচ বছরে স্বৈরাচার, দুর্নীতি, নৈরাজ্য ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির যে ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে তাতে রাজ্যের প্রধান বিরোধী জোটকে ঠিক করতে হবে যে মানুষকে সাথে নিয়ে শাসক দলকে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ জানাতে আদৌ তাদের সদিচ্ছা আছে কি না। ২০১৩ সালের মে মাস থেকে সারদা কাণ্ড নিয়ে বামফ্রন্ট যদি একক ভাবে নিরলস পরিশ্রম করে রাজ্য জুড়ে আগ্রাসী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারত তা হলে শেষবেলায় জোটের জন্য এ রকম হন্যে হয়ে ঘুরতে হত না। চিটিংবাজ ফান্ডের আর্থিক কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে ক্রমাগত তীব্র আন্দোলন করলে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০১৪ সালের লোকসভা ও ২০১৫ সালের পৌরসভা নির্বাচনগুলোয় বামেরা তৃণমূলকে দুর্নীতির অভিযোগে জেরবার করে এক বিশ্বাসযোগ্য বিরোধী রাজনীতির পরিসরকে বাড়াতে পারত। সারা বছর পড়াশোনা না করে অন্তিম লগ্নে স্টেজে মেরে দেওয়ার প্রবণতা রাজ্যে, বিরোধী রাজনীতির যেন বরাবর নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, শেষ মাসে অন্তত বিরোধীরা একটু ভালো ছাত্রের মতো খাটছে। কতটা ফল হয় সেটা সময় বলবে।

বাংলায় কার সঙ্গে জোট গড়া হবে সেটা রাজ্যের ইস্যু এবং নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজ্য কমিটি যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেই রাস্তা অন্তত সিপিআই(এম)-এর শেষ পার্টি কংগ্রেসের দলিলে আছে। রাজ্য রাজনীতির জোটের ফলে ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতিতেও তার প্রভাব পড়তে পারে কারণ কেন্দ্রে নির্বাচনী রাজনীতি (লোকসভা ও রাজ্যসভা নির্বাচন) হল আঞ্চলিক নির্বাচনী রাজনীতির যোগফল মাত্র। কংগ্রেস প্রশ্নে কাজেকর্মে অন্তত সিপিআই(এম), সুদূরপ্রসারী রণনীতি (স্ট্র্যাটেজি) আর স্বল্পমেয়াদি ও পরিবর্তনশীল রণকৌশলের (ট্যাকটিক্স) পার্থক্য করেছে। তাই সাম্প্রতিক অতীতে বড়ো বাম দলগুলো কংগ্রেসের সঙ্গে প্রাক নির্বাচনী আসন সমঝোতা করেছিল। যেমন ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশ (যেখানে কংগ্রেস প্রধান শক্তি ছিল) ও তামিলনাড়ুতে (যেখানে কংগ্রেস প্রান্তিক শক্তি ছিল) সিপিআই-সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হয়েছিল, যদিও একই নির্বাচনে বাংলা, কেরল ও ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস প্রতিপক্ষ ছিল। আবার ২০০৬ সালের বাংলা ও কেরলের বিধানসভা নির্বাচনে যখন বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস প্রতিপক্ষ, তখন একই সময়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-১ সরকারকে বামফ্রন্ট বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল। তখন কিন্তু কেরল ও বাংলার বাম নেতারা দিল্লিতে দোস্তি আর রাজ্যে কুস্তি করার বিড়ম্বনার কথা নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য করেননি। ২০১২ সালে কংগ্রেস সমর্থিত রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে দুই বড়ো বাম দল শুধু সমর্থনই করেনি বরং কেন ২০০২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মতো বামেরা নিজেদের প্রার্থী দেবে না বা কেন ভোটদানে বিরত থাকবে না এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কী ভাবে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে বিভাজনের সুযোগ নিতে হবে, এই সংক্রান্ত তত্ত্ব দিয়েছিলেন ভারতের সর্ব বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। তাই কংগ্রেসের হাত ধরা নিয়ে যাদের সাম্প্রতিক অতীতে এমন জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত আছে তাদের যদি আজ হঠাৎ কংগ্রেসের প্রতি অরুচি হয় তা হলে বলতে হবে যে নিজেদের সাম্প্রতিক ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে আর একবার 'ঐতিহাসিক ভুল' হবে।

জোট হোক বা না হোক, শান্তিপূর্ণ যেন ভোট হয়। বিরোধীদের জোটের থেকে রাজ্যের মানুষের কাছে অনেক বড়ো বিষয় হল যে তাঁরা নিজেদের ভোট স্বচ্ছন্দে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে যেন দিতে পারেন। গত লোকসভা নির্বাচনে, নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক বিরোধীদের তোলা নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে উদাসীন মনোভাব দেখিয়েছিলেন। অনেক জায়গায় শাসক দলের রিগিং এবং নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এহেন অভিযোগ যদিও বহু নির্বাচনেই বিরোধীরা করে থাকেন। কিন্তু রাজ্যে বিগত কয়েকটা নির্বাচনে শাসক দলের কর্মীদের তাণ্ডবলীলা যে ভাবে টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠেছে তাতে নিরাপদে ভোট দেওয়ার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে মানুষের আশা যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচন করার জন্য সদর্থক ভূমিকা নেবে। কেবলমাত্র সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার জোরেই সেই কঠোর নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে এক বিন্দু পিছপা হবে না। আশা করা যায় তার জন্য মহাভারতের বলরামের কথা স্মরণ করাতে হবে না।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক